ভিটে হারানোর যন্ত্রণা: সিনেমায়

ইরাবান বসুরায়

মানবিক অস্তিত্বের একটা বড়ো লক্ষণ তার সম্পর্কগুলির টান। আত্মীয়স্বজন, পূর্বপুরুষের স্মৃতি, জনপদ, পরিবেশ, খেতখামার, ভিটেমাটি — এই সব মিলিয়ে তৈরি হয় একজনের পরিচয়, তৈরি হয় তার মন। অনেকসময় ব্যক্তিনাম থেকেও বড়ো হয়ে ওঠে এই পরিচয়, গ্রাম শহর জনপদেই চিহ্নিত হতে থাকে ব্যক্তির অস্তিত্বের অভিজ্ঞান। সেই অভিজ্ঞান যখন হারিয়ে যায়, যখন সে উৎখাত হতে থাকে তার নিজস্ব জায়গা থেকে, তখন তার আর কোনো ব্যক্তিপরিচয় থাকে না, সেই পরিচয় অবলুপ্ত হয়ে যায় একটা জটপাকানো সমষ্টিগত নামের মধ্যে — সে তখন 'বাস্তুহারা'। পরিচয় হারিয়ে যাওয়ার এই অভিজ্ঞতা যন্ত্রণার, তিক্ততারও বটে, সেই সঙ্গে তা ব্যক্তিকে করে তোলে বিমূঢ় ও অসহায়। অথচ এই অভিজ্ঞতা দেশে দেশে কালে কালে পুনরাবৃত্ত হতে থাকে, আর সে-কারণেই তা হয়ে ওঠে ইতিহাস। ইতিহাস লিখিত হয় তথ্যে, দলিলে, পাশে থেকে যায় কথিত ইতিহাস, সে-ইতিহাস রচিত হয় ব্যক্তির দীর্ঘশ্বাসে, বেদনায়। আর ব্যাক্তির এই ইতিহাস হয়ে ওঠে শিল্পের এক বড়ো অবলম্বন। সে ইতিহাস তো সামাজিক ইতিহাসও।

বাস্তুচ্যুতির কারণ অবশ্য নানারকম। প্রাকৃতিক কারণে মানুষকে ছেড়ে আসতে হয় তার ভিটেমাটি, বন্যা বা ভূমিকম্প তাকে উৎখাত করে দেয়, সেই ভিটেমাটি অবলুপ্ত হয়ে যায়, সেখানে থেকে যায় শুধু স্মৃতি। কিন্তু যখন বাস্তুচ্যুতি ঘটে দাঙ্গায় বা রাজনৈতিক কারণে, ভিটেমাটিটা থেকে যায় কিন্তু তা আর নিজের থাকে না, তখন শুধু স্মৃতি নয়, সেই স্মৃতির সঙ্গে যুক্ত হয় বঞ্চনার ক্ষোভ। প্রকৃতির নির্দয়তার সামনে মানুষ শুধু নিজের অসহায়ত্বকে গালি দিতে পারে, কিন্তু সাম্প্রদায়িক বা রাজনৈতিক বিপর্যয়ে যখন বাস্তুচ্যুতি ঘটে তখন স্মৃতির সঙ্গে যুক্ত হয় অস্তিত্বর আধখানার সঙ্গে অপর অর্ধেকের যোগসূত্র ছিন্ন হয়ে যাওয়ার যন্ত্রণা। একটা ভিটে থেকে যায়, কিন্তু সেটা আর তার নয়, সেখানে সে আর ফিরে যেতে পারবে না, এই বোধ অনেক বেশি আহত ও রক্তাক্ত করতে থাকে। একে কীভাবে ধরতে পারে শিল্প, বিশেষ করে সিনেমা! কীভাবে তা ব্যক্তির মানসিক বিপর্যয়কে করে তুলতে পারে সামাজিক অভিজ্ঞতার অংশ আর সামাজিক সংকটকে করে তুলতে পারে ব্যক্তির সংকটের অভিজ্ঞান! সিনেমার ক্ষেত্রে প্রশ্নটা আরও জরুরি, কেননা তথ্যচিত্র ছাড়া অন্যত্র, অর্থাৎ কাহিনীচিত্রে 'দৃশ্য' এবং 'শব্দ'ই একমাত্র উপাদান, আবার তা উপকরণও বটে, যা দিয়ে নির্মাতাকে পৌঁছতে হয় তার উদ্দেশ্যে। এখানে সিনেমার মধ্যে নির্মাতার ঢুকে পড়ার কোনো জায়গা নেই, লিখিত ও পাঠ্য মাধ্যমে যেটা সম্ভব। কোনো লিখিত শিল্পে লেখক সরাসরি পাঠকের সঙ্গে কথা বলতে পারেন, পাঠককে সম্বোধন করে তাঁর বক্তব্য জানিয়ে দিতে পারেন, আর এই প্রত্যক্ষতা যদি শিল্পবিরুদ্ধ হয় তাহলে তিনি নিজেকে আড়ালে সরিয়ে ঘটনা, চরিত্র সবই বিশ্লেষণ করতে পারেন, বর্ণনা দিতে পারেন, ব্যাখ্যা করতে পারেন। সে সুযোগ সিনেমায় নেই, এখানে নির্দেশককে অপেক্ষা করতে হয় — তাঁর রচিত দৃশ্যমালা দর্শকের সঙ্গে কতটা সংযোগ স্থাপন করতে পারছে! বাস্তুচ্যুতির যে শরীরী অভিঘাত তা তিনি দর্শককে প্রত্যক্ষ করাতে পারেন, কিন্তু

যে মানসিক উৎকণ্ঠা তৈরি হয় তাকে কীভাবে দর্শকের উপলব্ধিতে পৌঁছে দেবেন নির্দেশক! এখানেই সিনেমার বড়ো চ্যালেঞ্জ।

চ্যালেঞ্জটা আরও বড়ো হয়ে দেখা দেয়, কেননা বাস্তুচ্যুতি তো কোনো কাল্পনিক সংকট নয়, তা অত্যন্ত প্রত্যক্ষ বাস্তব। বন্যা, ঘূর্ণিঝড়, দাঙ্গা অনেকসময়ই বহু মানুষকে বাস্তুচ্যুত করছে, কিন্তু ভারতীয় উপমহাদেশে উনিশশো সাতচল্লিশ সালে দেশভাগ নামক যে রাজনৈতিক বিশ্বাসঘাতকতাটি ঘটে গেল, তার ফলে বাস্তুচ্যুতি আর কোনো স্থানীয় সমস্যা রইল না, তা হয়ে গেল এক আন্তর্দেশীয় সমস্যা। দেশভাগ হয়েছিল ধর্মের অজুহাতে, আসলে তা ছিল কিছু রাজনৈতিক নেতার উচ্চাকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করার উপায় মাত্র। ধর্মকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য ব্যবহার করা হয়েছিল, সেজন্য দীর্ঘদিন ধরে ক্ষেত্র প্রস্তুত করা হচ্ছিল। দেশভাগের পর দুটি 'স্বাধীন' রাষ্ট্রের জন্ম হলো, আর শুরু হলো এক বিপুল জনসমষ্টির নিজেদের ভিটে থেকে উচ্ছেদ হবার দীর্ঘ এক আখ্যান। এ আখ্যান এতটাই দীর্ঘ এবং এর তাৎপর্য এতই সুদূরপ্রসারী যে ষাট বছর পরেও সেই ঘা শুকোয় না, এমনকী তার জ্বালা উত্তরপুরুষদের মধ্যে সংক্রামিত হয়ে যায়। দেশভাগ এমন এক বাস্তবতার জন্ম দিল, যার পিছনে থেকে যায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার স্মৃতি। ফলে অসংখ্য মানুষ ঘর ছাড়তে বাধ্য হলো। পুরুষানুক্রমে যে মাটিতে তাদের বাস, সেই মাটি ছেড়ে, পরিচিত জলহাওয়া ছেড়ে অসংখ্য মানুষকে পা বাড়াতে হলো এক অনির্দিষ্ট পরিণতির দিকে, পাঞ্জাবের পুব থেকে পশ্চিমে, পশ্চিম থেকে পুবে, বাংলার পুব থেকে পশ্চিমে, আর পশ্চিম থেকে পুবেও অনেকটা। একটা নতুন সমষ্টিগত পরিচয় তৈরি হলো 'উদ্‌বাস্তু', পাকিস্তানে যাদের নাম মোহাজির। যেখানে পৌছল সেখানে তারা যে খুব স্বাগত তা নয়, তবু বাঁচার জন্য তাদের লড়াই করতেই হয়। এই বাস্তবতা ইতিহাসের অংশ, একে শিল্পে আনতে গেলে এই বাস্তবতাকে বদলানো যায়

না। কাহিনীচিত্রকে যখন পুনর্নির্মাণ করতে হয় এই বাস্তবতাকে মেনে নিয়েই তা করতে হয়। সেখানে অন্য একটা সমস্যাও তৈরি হয়। বাস্তবতার দায় মানে তো ইতিহাসের দায়; সে-দায় কঠিন এবং অস্বস্তিকরও বটে। বাংলা সাহিত্য ও সিনেমায় দেশভাগের মতো এত বড়ো একটা ঘটনা খুব কমই জায়গা পেয়েছে, তার একটা কারণ সম্ভবত যে-সব শক্তিশালী লেখকরা নানা প্রগতি-আন্দোলনে যুক্ত ছিলেন বা যে-সব সিনেমা বা নাট্যশিল্পীরা গণনাট্য-আন্দোলনের সঙ্গে ছিলেন তারা অস্বীকার করতে পারেননি যে কম্যুনিস্ট পাটি দেশভাগকে সমর্থন জানিয়েছিল। তাই দেশভাগের পর ওই বিপুলসংখ্য উদ্বাস্তুর আসা, তাদের যন্ত্রণা শিল্পীদের স্পর্শ করলেও সম্ভবত তা নিয়ে কোনো শিল্পরচনায় তাঁরা অস্বস্তি বোধ করেছিলেন। সাহিত্যেই সেটা আসেনি, সিনেমার মতো দৃশ্যশিল্পে সম্ভাবনা তো আরও কম। সমস্যা আরও আছে। যাঁরা ভেবেছিলেন এ-ব্যাপার নিয়ে ছবি করবেন, তাঁদের পক্ষে আবেগাপ্লুত হয়ে পড়ার সম্ভাবনা ছিল যথেষ্ট বেশি, আর আবেগের বাহুল্যে অনেকসময় সত্য চাপা পড়ে যায়। যেমনটি ঘটেছিল ঋত্বিককুমার ঘটকের ক্ষেত্রে।

পুববাংলা থেকে বাস্তুহারা হয়ে যে-সব মানুষ এসেছিলেন বা যাঁদের যেতে হয়েছিল পশ্চি ম থেকে ঢাকা বা অন্য কোথাও, কিংবা পাঞ্জাবের পুব-পশ্চিম জুড়ে দুই বিপরীতমুখী স্রোতে ভাসতে হয়েছিল যে নিঃস্ব মানুষদের, তাঁদের মানসিক যন্ত্রণার একটা বড়ো কারণ ছিল এই যে, যে-ভিটে ছেড়ে তাঁদের যেতে হচ্ছে, সেই ভিটেটা থেকে যাচ্ছে একইরকম, শুধু তাঁরা সেখান থেকে উৎখাত হচ্ছেন, সেই ভিটেতে তাঁদের আর কোনো অধিকার থাকছে না, ফলে শিকড়হীনতার বোধ অনেক তীব্র হয়ে ওঠে, তার সঙ্গে যুক্ত হয় অধিকার হারানোর বেদনা। এই বোধ, এই বেদনার দুটো চেহারা — একটা তার প্রত্যক্ষ শারীরিক রূপ, অন্যটি তার উপলব্ধির, অনুভবের অপ্রত্যক্ষ রূপ। সিনেমার দৃশ্য-নির্ভরতায় এই শারীরিক রূপটিকে

দেখানো অপেক্ষাকৃত সহজ, অন্যদিকে উপলব্ধিকে, অনুভবকে দৃষ্টিগ্রাহ্য করে তোলা ততটাই কঠিন। এটা অবশ্য একেবারেই সিনেমার নিজস্ব সমস্যা, বিষয়ের নয়। অথচ দর্শকের প্রত্যাশা থাকতেই পারে, যে বিপুল সংখ্যক মানুষের নিরাশা-বেদনা-যন্ত্রণা-ক্ষোভ-ক্রোধ ও স্মৃতিকাতরতা জড়িয়ে ছিল দেশভাগের সঙ্গে, বাস্তুচ্যুত হওয়ার পরবর্তী অধ্যায়ে যে লাঞ্ছনার মধ্য দিয়ে যেতে হয়েছে তাদের, তার কিছু চিহ্নকে শিল্প ধারণ করবে — এই প্রত্যাশা অন্যায় নয়। বাংলা সাহিত্য সে-প্রত্যাশা পূরণ করেনি, সিনেমাও নয়। ঋত্বিক ঘটকের যে তিনটি ছবিকে বারবার উদ্‌বাস্তু জীবনের ছবি বলে আখ্যাত করা হয়, সেগুলি নিম্ন-মধ্যবিত্ত পরিবারের কাহিনী হতে পারে, তাদের জীবনসংগ্রাম, আশাআকাঙ্ক্ষার কথা হতে পারে, কিন্তু বিশেষ করে উদ্‌বাস্তুদের সমস্যার কথা এইসব ছবিতে নেই। *মেঘে ঢাকা তারা*-য় কলোনির জীবন আছে, এটুকুই বাস্তুহারা-স্পর্শ। বাকিটা অন্য প্রসঙ্গ। *সুবর্ণরেখা*-য় তো শুধু উদ্‌বাস্তু-কলোনিতে নতুন জীবন গড়ার শপথ দিয়ে শুরু, তারপর ছবি সরে যায় একবারে ভিন্ন এক পরিসরে। *কোমল গান্ধার*-এ নিম্ন-মধ্যবিত্ত জীবন নয়, মোটামুটি স্বচ্ছল পরিবারের নায়ক-নায়িকার জীবনে ঘর ছেড়ে আসার বেদনা বৌদ্ধিক আবেগের উৎস। তাহলে বাংলা সিনেমায় নিজের ভূমি থেকে উচ্ছেদ হওয়ার যন্ত্রণা কোথায়! শিকড় ছিঁড়ে যাওয়ার বেদনা বরং অন্যভাবে ধরেছিলেন অরবিন্দন তাঁর *বাস্তুহারা* ছবিতে। একটি ছবির দিকেই দর্শককে ফিরে তাকাতে হয় — নিমাই ঘোষের *ছিন্নমূল*। গণনাট্য সঙ্ঘ থেকে আসা নিমাই ঘোষের এ-ছবি হয়ত কম্যুনিস্ট পার্টির পাকিস্তান-প্রস্তাব সমর্থন করার ভুলের খানিকটা প্রায়শ্চিত্ত।

ছিন্নমূল-এর বড়ো বৈশিষ্ট্য হলো এই ছবি উদ্‌বাস্তু হওয়ার সমস্যাকে দেখতে চেয়েছে নিম্নবর্গের জীবন থেকে। ঋত্বিকের ছবির কেন্দ্রীয় চরিত্ররা সকলেই উচ্চবর্ণের, মধ্যশ্রেণীর মানুষ। *সুবর্ণরেখা*-র অভি জন্মসূত্র বাগ্‌দি হলেও সে-পরিচয় চাপা ছিল, সে বড়ো হয়ে উঠেছে

ব্রাহ্মণ ঈশ্বরের পরিবারে, সেখানেই তার লেখাপড়া শেখা। অর্থাৎ তার শ্রেণীচ্যুতি ঘটে গেছে। দেশভাগের ফলে পুব-বাংলা থেকে যাঁরা বাস্তুচ্যুত হয়ে ভারতে চলে আসতে বাধ্য হয়েছিলেন তাদের মধ্যে উচ্চবর্ণ ও নিম্নবর্ণ, দুই শ্রেণীর মানুষই ছিলেন। কিন্তু উচ্চবর্ণের মানুষদের ক্ষেত্রে বাস্তুচ্যুত হওয়ার বেদনার সঙ্গে ছিল নতুন জায়গায় মানিয়ে নেওয়ার কিছুটা রসদ। এই উচ্চবর্ণের মানুষরা, মূলত উচ্চবিত্ত ও মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের লোক, পুববাংলায় জমির সঙ্গে তাঁরা জড়িয়ে ছিলেন উপস্বত্বভোগী হিসেবে, তাঁদের জীবিকা ছিল অন্য। আর এই উপস্বত্বভোগী জীবনে তাঁদের স্মৃতিকাতরতা অনেকটাই তাঁদের ফেলে-আসা স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য। অন্যদিকে নিম্নবর্ণের মানুষ, বর্ণের জন্যই যাঁরা বিত্তহীন সেজন্য নিম্নবর্গীয়ও, তাদের সরাসরি সম্পর্ক গ্রামজীবনের নানা বৃত্তির সঙ্গে। তাঁরা গৃহচ্যুত, সেই সঙ্গে বৃত্তিচ্যুত। *ছিন্নমূল*-এ পরিচালক নিমাই ঘোষ এদেরই ধরতে চেয়েছেন। বস্তুত এই ছবিতে সেরকম কোনো ব্যক্তিনায়ক নেই, অতি-সাধারণ মানুষই এখানে কেন্দ্রীয় চরিত্র। এই চরিত্রগুলি তাদের দেশ ছেড়ে পাড়ি দিচ্ছে কলকাতায়— সে-যন্ত্রণা তো একই সঙ্গে অনিশ্চিত ভবিষ্যতের আশঙ্কাও। আশঙ্কা আর যন্ত্রণা এখানে কোনো ব্যক্তিবিশেষের নয়, তার সমষ্টিগত রূপটিকেই ধরা হয় *ছিন্নমূল*-এ। *ছিন্নমূল* শুরু হয় বাস্তুচ্যুতির প্রসঙ্গ দিয়েই। পুববাংলার কোনো এক গাঁয়ের বিপুল সংখ্যক মানুষকে শেষ পর্যন্ত সিদ্ধান্ত নিতে হয় গ্রাম ছেড়ে চলে যাওয়ার। সিদ্ধান্ত নেওয়াটা কঠিন, চরিত্রগুলির দ্বিধাদ্বন্দ্বময় আচরণে তা ধরা পড়ে। কিন্তু সিদ্ধান্ত নেওয়ার থেকে আরও কঠিন তো সেই সিদ্ধান্তকে কাজে পরিণত করা। *ছিন্নমূল*-এ একটি সিকোয়েন্সে ধরা হয় ভিটেমাটি ছেড়ে, দেশ ছেড়ে, পরিচিত আবহ ছেড়ে যাবার তীব্র বেদনা। এক বৃদ্ধা ঘরের খুঁটি আঁকড়ে ধরে শুধু বলে যাচ্ছেন — 'যামু না, যামু না। যামু না', ওই শাদামাটা উচ্চারণের মধ্যেই ধরা থাকে নিজের ভিটের জন্য প্রবল মমতা, আর সেখান থেকে উচ্ছিন্ন না হবার বিপুল আকুলতা। এই উচ্চারণে

কোনো আবেগের অতিরেক নেই, যেন না-যাওয়াটাই তো স্বাভাবিক। তবু যেতে হয়ই, আর সেখানেই ধরা পড়ে বাস্তুচ্যুতির, উচ্ছেদের ভয়াবহতা। ওই বৃদ্ধা ওই জনগোষ্ঠীটির প্রতীক হয়ে ওঠেন, এর আগে যাদের বারবার উচ্ছেদ হতে হয়েছে পোল্যান্ডে, প্যালেস্টাইনে, এর পরে যাদের বারবার সরে যেতে হবে পুববাংলা থেকে পশ্চিমবাংলায়, পশ্চিমবাংলা থেকে দণ্ডকারণ্যে, দণ্ডকারণ্য থেকে মরিচঝাঁপিতে, মরিচঝাঁপি থেকে নিরুদ্দেশে। *ছিন্নমূল*-এ ত্রুটি অনেক, তবু এরকম বেশ কিছু টুকরো সিকোয়েন্স এ-ছবিকে অনেকটাই শৈল্পিক মহিমা দিতে পারে। ওই বৃদ্ধার আকুতি চকিতে দর্শককে বুঝিয়ে দেয় — এই হলো উচ্ছেদ। ওই কাঠের খুঁটিটি যেন উচ্ছিন্ন জনগোষ্ঠীর সমগ্র স্বভূমির প্রতিমা হয়ে ওঠে।

সত্যজিৎ রায় *ছিন্নমূল*-কে বলেছিলেন — বাংলা ছবিতে বাস্তবধর্মিতার প্রথম উদাহরণ। পরিচালক এ-ছবিতে অভিনেতাদের সঙ্গে সত্যিকারের উদ্‌বাস্তুদের মিলিয়ে দিয়েছিলেন, ক্যামেরা লুকিয়ে শিয়ালদা স্টেশন বা অন্যত্র শ্যুটিং করেছেন, শুধু সেটাই এর বাস্তবধর্মিতার প্রমাণ নয়। বাস্তবধর্মিতা এর মনোভঙ্গিতে, সেকারণেই অন্যকিছু ছবির মতো ছেড়ে-আসা দেশের জন্য স্মৃতিকাতরতা থেকে ফিল্ম শুরু হয়নি, তারও আগে থেকে, এই স্মৃতিকাতরতায় পৌছনোর উৎস থেকেই ফিল্ম শুরু হয়েছে। ছবির শুরুর সিকোয়েন্স থেকেই গ্রামজীবনের নানা বৃত্তির মানুষদের দেখা যায়, চাষি, গোয়ালা, স্বর্ণকার, কুমোররা পরপর আসে, কিছুটা আরোপিত দৃশ্যমালা হলেও পারিবারিক গণ্ডিকে পেরিয়ে এসে নিমাই ঘোষ গ্রামের এক যৌথ সামাজিক জীবনকে ধরতে চেয়েছেন। বিপর্যয় যখন আসে, সেই যৌথ জীবনেই আসে। ফলে উচ্ছিন্ন জীবন আর কোনো একজনের বা একটি পরিবারের পরিণতি থাকে না, তা একটি সমাজেরই পরিণতি হয়ে যায়। সম্ভবত এটি গণনাট্য সংঘ বা নবান্ন নাটকের প্রেরণা থেকে হয়েছে। নিমাই ঘোষের কৃতিত্ব তাকে তিনি সিনেমার ভাষায় ধরতে চেষ্টা করেছেন। যৌথ জীবন, কিন্তু

এক-একটি চরিত্রের টাইপেজ লক্ষ করার মতো, তারা নিজেদের বৈশিষ্ট্য হারিয়ে ফেলেনি। এই যে মানুষগুলি নিজেদের ঘর হারিয়ে যাত্রা করল এক অজানা উদ্দেশে, তারা ভেবেছিল নতুন জায়গায় এসে তারা আবার ঘর পাবে। সে-স্বপ্ন তাদের ভেঙে যায়, যখন তাদের ঠাঁই হয় শিয়ালদা স্টেশনের পটফর্মে। বাস্তুচ্যুতির বাস্তবতার শরীরী রূপটি এখানে তীব্রভাবে ধরা পড়ে। শিয়ালদা স্টেশনের প্লাটফর্ম কোনো নতুন ভিটে নয়, সেখানে নতুন করে জীবন গড়া যায় না। *ছিন্নমূল* ছাড়া অন্য-কোনো সিনেমায় এই নরকবাসের ছবি উঠে আসেনি। তাদের ফেলে-আসা গ্রামের যে স্মৃতি তারা বহন করে এনেছে, বস্তুত যা এখনো পুরো স্মৃতি হয়ে যায়নি, অনেকটাই প্রায় বর্তমান হয়ে রয়ে গেছে, তার সঙ্গে কী নিদারুণ বৈপরীত্য স্টেশন-প্লাটফর্মের ওই ক্লিন্ন পরিবেশের। এখানে তাদের মানবিক পরিচয়টুকুই মুছে যায়, তারা এক দলাপাকানো সমষ্টি মাত্র, ভলান্টিয়ারদের, সমাজসেবীদের খাতায় আর সুযোগসন্ধানী ফড়ে-দালালদের কাছে তাদের একটাই পরিচয় — 'উদ্‌বাস্তু'। স্টেশনের উদ্‌বাস্তুশিবিরের চিত্রায়নে নিমাই ঘোষ চূড়ান্ত বাস্তবধর্মিতার পরিচয় দিয়েছেন। লং-টপ শটে স্টেশনে বাস্তুহারাদের বিশৃঙ্খল এলোমেলো ছন্নছাড়া সংসারের যে-ছবি ধরা পড়ে তা প্রায় এক ঐতিহাসিক দৃশ্য এবং এ-শটে কাহিনীচিত্রের মধ্যেই ডকুমেন্টারিকে মিলিয়ে দিতে পেরেছিলেন পরিচালক। সেই বাস্তবধর্মিতার দাবিতেই তো পেশাদার অভিনেতাদের পাশে সত্যিকারের বাস্তুহারাদের ব্যবহার করেছিলেন নিমাই ঘোষ। আর বাস্তবকে ধরতে চাওয়ার তাগিদেই পরিচালক ছবির শুরুতে দেখান গ্রামজীবনের এক যৌথ জীবনযাত্রাকে, যেখানে নানা শ্রেণী, জাত, বৃত্তিভেদ সত্ত্বেও এক সম্পৃক্ততা থেকে যায়। রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রে শুধু যে দেশভাগ হয় তাই নয়, এই গ্রামজীবনটাই ভেঙে যায়, একটা গোটা সমাজকে উৎখাত হতে হয় নিজেদের স্বভূমি থেকে; তারপরেও শিয়ালদা স্টেশনের নারকীয় পরিবেশেও তারা এক যৌথ জীবনকে ধরে রাখতে

চেষ্টা করে। এটা যেমন একদিকের সত্য, তেমনি অন্যদিকের সত্যকেও *ছিন্নমূল* উপেক্ষা করে না। একসময় এই বাস্তুহারারা একটা বাড়ি খুঁজে পায়, জোর করে সে-বাড়ি দখল করে তারা, সুন্দর না হোক একটা আশ্রয়, স্টেশনের জীবনের বদলে কিছুটা ক্লেদমুক্তি। এখানেও ভয় প্রতিমুহূর্তে, বাড়িঅলার গুণ্ডাদের আক্রমণের। কিন্তু সংকট তৈরি হয় অন্যত্র। চূড়ান্ত অভাব তাদের পাল্‌টে দিতে থাকে। ফেলে-আসা গ্রামজীবনে অভাব থাকলেও সহমর্মিতা ছিল, এই ক্যাম্পজীবনে যেন ঢুকে পড়ে শহরের হৃদয়হীনতা আর রুক্ষতা, সমষ্টিকে ছাড়িয়ে ব্যক্তি স্বার্থ বড়ো হয়ে উঠতে চায়। অভাব বদলে দিতে থাকে তাদের পারস্পরিক সম্পর্ক, তিক্ত হয়ে যেতে থাকে তাদের সংযোগ। অন্যদিক পয়সা রোজগারের জন্য যে-কাজই করুক না কেন তারা, প্রাণপণে অন্যদের কাছ থেকে তা লুকিয়ে রেখে নিজেদের আত্মাভিমান বজায় রাখতে চায় তারা। এ এক করুণ ট্রাজেডি। আর এখানেই থেকে যায় বাস্তুহারা হওয়ায় শরীরী বাস্তবতা। *ছিন্নমূল* শৈল্পিক বিচারে দুর্বল হলেও, অনেক ত্রুটি সত্ত্বেও এই বাস্তবতার অভিঘাতটুকু এনে দিতে পারে দর্শকের মনে।

ছিন্নমূল যদি বাস্তুহারা-জীবনের জ্বলন্ত সমস্যাগুলোকে তুলে ধরার চেষ্টা করে থাকে, তাহলেও বলতে হয় বাস্তুচ্যুতির ফলে মানসিক যে শূন্যতা তৈরি হয় এ-ছবিতে তা দেখানোর অবকাশ কম। এর একটা কারণ এই মানসিক শূন্যতার বোধ আসে সমস্যাগুলো একটু থিতিয়ে যাওয়ার পর। *ছিন্নমূল*-এর অনেকদিন পর শ্যাম বেনেগাল নির্মাণ করেছিলেন *মাম্মো*। এই ছবির পটভূমি আলাদা, বিন্যাস আলাদা, বিষয় আলাদা। সে-অর্থে বাস্তু চ্যুতির প্রসঙ্গ এখানে নেই। এমনকী *মাম্মো*-র ঘটনাকালও দেশভাগের অনেক পরবর্তী। মাম্মো ঠিক বাস্তুচ্যুত নন, তাঁর ক্ষেত্রে সমস্যাটা হলো মানসিক বাসভূমির সঙ্গে বিচ্ছেদ। জি. অরবিন্দন তাঁর *বাস্তুহারা* ছবিতে উদ্‌বাস্তু জীবনের বাইরের সমস্যার বদলে জোর দিয়েছিলেন অন্তর্লীন সংকটের উপর,

শ্যামের ছবিতে সেই সংকট অনেকটা প্রকাশ্য। *ছিন্নমূল*-এ রাজনৈতিক চক্রান্তের প্রসঙ্গ খুব বেশি আসেনি, সথ্যুর *গরম হাওয়া*-তে বরং দেশভাগের রাজনীতি ও তার পরবর্তী অবস্থাকে ধরার চেষ্টা ছিল। শ্যাম বেনেগালের *মাম্মো*-তে আছে নিজের জায়গা হারিয়ে ফেলার যন্ত্রণার কথা যার কারণ দেশভাগের রাজনীতি। দেশভাগের ধাক্কা বাঙালি জীবনে একভাবে লেগেছিল, উত্তর ও পশ্চিম ভারতের উর্দুভাষী মুসলিম সমাজে লেগেছিল আরেকভাবে। অখণ্ড ভারতের উত্তর, উত্তরপশ্চিম ও পশ্চিমাঞ্চল জুড়ে যে উর্দুভাষী মুসলিম সমাজ ছড়িয়ে ছিলেন, তাঁদের পরস্পরের মধ্যে আত্মীয়তার বন্ধন ছিল। দেশভাগের পর সেই আত্মীয়তার বন্ধনের মাঝখানে একটা দেয়াল উঠে গেল। কেউ রইলেন ভারতের নাগরিক, কারও পরিচয় হয়ে গেল পাকিস্তানি। রাষ্ট্রিক বিভাজন আত্মীয়তার মাঝখানে এনে দিল বিচ্ছিন্নতা। স্বভাবতই মানুষের হৃদয় সেই বিচ্ছিন্নতা, বিভাজন মানতে চায় না। *মাম্মো* হৃদয় ও রাজনীতির দ্বন্দ্বকে দেখাতে চেয়েছে, তবে রাজনীতির তর্কবিতর্ক জায়গা পায়নি এ-ছবিতে, তার বদলে শ্যাম দেখাতে চেয়েছেন রাজনীতি কীভাবে একজনকে উৎপাটিত করে দেয় তার পরিবেশ থেকে, তার সম্পর্ক থেকে। মাম্মো বিয়ের পর স্বামীর সূত্রে পাকিস্তানের বাসিন্দা, তাঁর নাগরিকত্ব পাকিস্থানের। স্বামীর মৃত্যুর পর মাম্মো আসতে চান তাঁর দিদির কাছে, যে-দিদি ভারতীয় নাগরিক! শ্যামের ছবিতে মাম্মো পারিবারিক নানা সমস্যার কারণ হয়ে দাঁড়ান, তাঁর সব ব্যাপারে জড়িয়ে পড়া, অতিরিক্ত কথা বলা এইসব কারণে। কিন্তু মূল ব্যাপারটি হলো, পারিবারিক বৃত্তে মাম্মোকে নিয়ে যে-সমস্যাই হোক, মূল সমস্যা মাম্মোর অবস্থান। দিদির সংসারে এতদিনের অনুপস্থিতির পর মাম্মো একজন আগন্তুক, রাষ্ট্রের কাছে মাম্মোর পরিচয় তিনি একজন বিদেশী। তার আত্মীয়স্বজনের সূত্রে মাম্মো যতই দেশে থাকতে চান, রাষ্ট্র সেই হৃদয়াবেগকে কোনো রকম প্রশ্রয় দিতে রাজি নয়। রাষ্ট্রের কাছে মাম্মো আত্মীয় নন।

এই তাহলে মাম্মো বা মাম্মোর মতো আরও অনেকের আখ্যান। একটি বিশাল জনগোষ্ঠী, যাঁরা ছড়িয়ে ছিলেন দেশের নানা অঞ্চলে, হঠাৎই তারা একের থেকে অন্যরা আলাদা হয়ে গেলেন। দেশ ভাগ হলো, পরিচয় ভাগ হয়ে গেল। পাকিস্তানে হয়ত মাম্মোরা মোহাজির, ভারতে তারা বিদেশী। তাদের আর কোনো স্বাভাবিক পরিচয় নেই। ঘনিষ্ঠজনদের মধ্যে একটা বিচ্ছিন্নতা তৈরি হয়ে যায়, শুধু রাষ্ট্রিক বিভাজনের সুবাদে। আসলে এর ফলে মাম্মোরাও উচ্ছিন্ন হয়ে যান তাঁদের পরিবার, পরিবেশ, সমাজ থেকে, তাঁদের বাধ্য করা হয় উচ্ছিন্ন হতে। স্থানিক ভাবে যারা বাস্তুহারা তাদের মতোই মাম্মোদেরও আর ফেরার কোনো উপায় থাকে না, কেননা যেখানে ফিরবেন তাঁরা সেটা বিদেশ। ফলে তাঁরাও মনোজগতে উদ্‌বাস্তু, তাঁদের শিকড় কেউ টেনে উপড়ে ফেলে দিয়েছে। এ-ছবিতে মাম্মো অবশ্য প্রাণপণে সেই শিকড়টাকে আবার মাটিতে পুঁততে চাইছেন, কিন্তু সেজন্য তাঁকে মুছে ফেলতে হবে তাঁর আগন্তুক পরিচয়। আর সেখানেই রাষ্ট্র বাধা দেয়। রাষ্ট্র শিকড় বোঝে না, রাষ্ট্র মানবিক সম্পর্ক বোঝে না, সে বোঝে শুধু ভৌগোলিক সীমানা, বোঝে শুকনো আইন। ভিসার মেয়াদ ফুরিয়ে যাবার পরও মাম্মো এ-দেশে থেকে যাওয়ার ফলে তাঁকে মুম্বাই থেকে টেনে হিঁচড়ে ট্রেনে তুলে দেয় রাষ্ট্রের প্রহরীরা, পুলিশরা মাম্মোকে সান্ত্বনা দেবার ভঙ্গিতে বোঝায় — পাকিস্তানই তোমার দেশ। এই যে চেনা জায়গাটা বিদেশ হয়ে গেল, তার বদলে একটা নতুন স্থানিক পরিচয়, সেটাই তাঁর স্বদেশ — এটাই মাম্মোর যন্ত্রণা। মাম্মো যখন পাকিস্তানে গিয়েছিলেন, তখন এই যন্ত্রণা তাঁকে টের পেতে হয়নি। কেননা প্রাথমিক ভাবে তিনি স্বামীর ঘর করতে গিয়েছিলেন, সেখানে স্থানিক পরিচয় নিয়ে তাঁকে চিন্তিত হতে হয়নি। স্বামীর মৃত্যুর পর বোন, বোনের পরিবারের সঙ্গে সংযোগ নতুন করে গড়ে উঠবে এটাই স্বাভাবিক, অন্তত প্রাচ্যের পারিবারিক প্রথায় তাই হয়। আর সেখানেই মাম্মোকে ধাক্কা খেতে হয়। পরিবারের ভিতরে যে ধাক্কা আসে সেটা একেবারেই

মাম্মোর ব্যক্তিগত সমস্যা। দিদি, দিদির নাতি সবাই তাদের নিজস্ব ছকের মধ্যে একজন হঠাৎ করে এসে পড়ায় কিছুটা বিব্রত, এ-সমস্যাটা কাটিয়ে ওঠার জন্য মাম্মো চেষ্টা চালিয়ে যান। কিন্তু তাঁর পরিচয় যারা কেড়ে নিয়েছে সেই রাষ্ট্র তাঁকে এ-সুযোগ দিতে রাজি নয়। ফলে মাম্মোকে ঘর হারাতে হয়, যাদের মাঝখানে তিনি ভালোবাসার খোঁজ করতে চেয়েছিলেন, সেখান থেকে তাঁকে ছিঁড়ে নেওয়া হয়, তাকে পরদেশী করে দেওয়া হয়।

বাস্তুচ্যুতির এও আরেক উদাহরণ। কোন্‌টা মাম্মোর নিজের ঘর! সেটা তিনি নিজে ঠিক করতে পারবেন না, রাষ্ট্র ঠিক করে দেয় পাকিস্তানই তাঁর নিজের ঘর। উদ্‌বাস্তু হওয়ার শরীরী অভিঘাত এখানে নেই, মাম্মো যে তাঁর চেনা জগতে আর ফিরতে পারছেন না, তাঁকে ফিরতে দেওয়া হচ্ছে না, সেই মানসিক অভিঘাতই এ-ছবির মূল কথা। দিদির সংসারে একসময় মাম্মো নিজেকে অবাঞ্ছিত মনে করেছিলেন, অভিমানে ঘর ছেড়ে এসেছিলেন। সেই অভিমান মুছে যায়; দিদি আর দিদির নাতি সাজিদ তাঁকে ঘরে ফিরিয়ে আনে, প্রবল বৃষ্টি, ঝোড়ো হাওয়ার মধ্যে মসজিদে মসজিদে, আশ্রয়নিবাসে তাঁরা মাম্মোকে খুঁজে বেড়াচ্ছিলেন। এই মানবিক আকুতি কিন্তু মাম্মোর বিদেশী পরিচয় মুছে দিতে পারে না। *গরম হাওয়া*-র কথা মনে পড়ে যায়, সেখানেও পাকিস্তান থেকে কাকার বাড়িতে আসা ছেলেটিকে পুলিশ ধরে নিয়ে যায়। মাম্মো যেটাকে নিজের জায়গা মনে করেন, সেখান থেকে তাকে জোর করে নিয়ে যায় পুলিশ, মাম্মো যেতে চান না, যেমন যেতে চায়নি হাভেলি ছেড়ে সেই বৃদ্ধা *গরম হাওয়া*-তে, যেমন যেতে চায়নি শ্রীলঙ্কার ছবি প্রশান্ত বিথানগোর *অগাস্ট সান*-এর এলটিটিই-র নির্দেশে গ্রাম ছাড়তে হওয়া সেই মুসলিম বাচ্চাটি তার কুকুরটিকে ছেড়ে, যেমন যেতে চায়নি *ছিন্নমূল*-এর বৃদ্ধা। ভিটে ছাড়ার যন্ত্রণা পেতে হয়নি, কিন্তু পরবাসী হওয়ার বেদনাকে তিনি এড়াতে পারেননি। এ ভাবেও তো উদ্‌বাস্তু হয়। শ্যামের ছবিতে মাম্মো অবশ্য ফিরে আসতে পেয়েছিলেন, মৃতের

পরিচয়ে। একটা ডেথ সার্টিফিকেট জোগাড় করে মাম্মো চলে আসেন, তিনি এখন মৃত, মৃতের কোনো নাগরিকত্ব থাকে না, সুতরাং তাঁকে নিয়ে আর টানাহ্যাঁচড়া হবে না। সেও তো নিজের পরিচয় থেকে উচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া, এমনকী নিজের জীবন থেকেও।

এভাবে রচিত হয়ে চলে উচ্ছেদের, বাস্তুচ্যুতির আখ্যান; পোল্যান্ড বা বসনিয়ায়, রুয়ান্ডা-বা শ্রীলঙ্কায়, নেলিতে বা মরিচঝাঁপিতে, রেললাইনের ধারে কিংবা বেলেঘাটার খালপাড়ে। উচ্ছেদ হয়, বাস্তু হারায় মানুষ কখনো জাতিবিদ্বেষে, কখনো ধর্মের নামে হানাহানিতে কখনো বা উন্নয়নের স্বার্থে। বাস্তুহারাদের মিছিল বড়ো থেকে আরও বড়ো হতে থাকে, সে-মিছিলের প্রত্যক্ষ চেহারাকে কখনো সিনেমা ধরে, কখনো-বা তার অন্তর্নিহিত মনোবেদনাকে ধরতে চায়। কখনো কখনো ধরতে পারেও না।